উচ্চশিক্ষায় নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা এখন বড় চ্যালেঞ্জ

সংবাদ : ড. মিহির কুমার রায়

| ঢাকা , শনিবার, ১২ অক্টোবর ২০১৯

সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চশিক্ষার মান ও নৈতিকতা নিয়ে সর্বমহলে আলোচনা চলছে এবং টেলিভিশন চ্যানেল ডিবিসি এর রাজকাহন টকশোতে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এ বিষয়টি স্থান পায় যেখানে দুটি পাবলিক ও একটি শীর্ষ স্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। আলোচনায় উঠে এসেছে দেশের ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য হিসেবে যোগ্য জ্ঞান তাপস ব্যাক্তি পাওয়া দুষ্কর, দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ আছে তা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২ শতাংশ এরও কম, গবেষণা খাতে বরাদ্দ প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে বিশেষত বরাদ্দ ও আগ্রহী গবেষকের সংখ্যাধিক্ষের ভিত্তিতে। এ বিষয়গুলোর ওপর ভিন্নমত পোষণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপচার্য বলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান নির্বাহী হিসাবে উপাচার্য যদি মনে করেন আদর্শ আর নৈতিকতার মানদণ্ডে তিনি তার শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে পরিচালনা করবেন তা হলে কি কোন বাধা আছে? উপচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি

নীতি নির্ধারণী ফোরামের যাথাক্রমে সিন্ডিকেট ও একাডেমি কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত রয়েছেন এবং একটি স্বায়িত্তশাসিত সংস্থার কর্নধার হিসাবে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোন শিক্ষার মান বাড়ছে না? কেনইবা ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এ বিশ্বের এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গুলো স্থান করে নিতে পারছে না কিংবা আঞ্চলিক পর্যায়েও নয় অথচ ভারতে এই সংখ্যাটি ৩৬ এর কোঠায় রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে এ সব র‍্যাংকিংয়ের মানদণ্ড কি? সেই টকশোতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আগত উপাচার্য বলেছিলেন গবেষণা ও গবেষকের মান এই র‍্যাংকিংয়ের একটি বড় নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় অথচ শিক্ষক কিংবা ছাত্র যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার প্রান কেন্দ্র তাদের মধ্যে অনাগ্রহ যথেষ্ট রয়েছে যার প্রমাণ পাওয়া যায় দেশের প্রথমসারির পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এমএস, এমফিল কিংবা পিএইচডি এর (output) দেখে। অথচ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণার জন্য বিশাল অবকাঠামো রয়েচে যেমন আধুনিক লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, সেমিনার রুম, গবেষকদের জন্য হোস্টেলে একক রুমে বাসস্থান, ক্যাফেটারিয়া, শরীর চর্চার মাঠ ইত্যাদি ।

এমন একটা সময় ছিল যখন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা শেষ করে ছাত্রছাত্রীরা চাকরির

অপেক্ষায় না থেকে গবেষণা ছাত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতো এবং শিক্ষকদেরও অনেক অনুপ্রেরণা থাকত। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর অনেক স্বল্পতা রয়েছে এবং বর্তমানে গবেষণা রত এমফিল/পিএইচডি ছাত্রদের কাছ থেকে প্রায়শই একটি অভিযোগ পাওয়া যায় যে তারা তত্ত্বাবধায়ক (supervisor) দের কাছ থেকে তেমন কোন কার্যকরি সহযোগিতা পান না যা উচ্চতর গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বলে বিবেচিত। আলোচিত টকশোতে আরও বক্তব্য এসেছে উচ্চশিক্ষায় মান সম্মত ও নৈতিকতার আলোকে উদ্ভাসিত শিক্ষকদের বড়ই স্বল্পতা এবং শিক্ষার মান নিয়ে সমাজের বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, অভিবাবক এমনকি সরকারপ্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীও উদ্বিগ্ন রয়েছেন। অনেকে বলেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি সত্যিই কোন সময়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে কিছু ছিল? এই নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিংবা তর্ক-বিতর্ক চলমান থাকবেই এবং এর মধ্যেও যে ভালো শিক্ষাক্রম কিংবা উজ্জীবিত শিক্ষক কিংবা ভালো গবেষক সৃষ্টি হচ্ছে না তা বলা যাবে না।

গত এক বছর আগে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষিকা নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞা শীর্ষক একটি চমৎকার উপস্থাপনা দিয়েছিলেন যা ছিল বিশ্লষণাত্মক, তত্ত্ববহুল ও প্রয়োগধর্মী। উক্ত সেমিনারের

সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন কে বলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গবেষণা জানেন না? আসলে বিষয়টি এরকম যে যারা গবেষণা করছেন করছেনই যাদের সংখ্যা খুবই সীমিত এবং এর প্রধান কারণ জ্ঞান চর্চা থেকেই শিক্ষকদের ক্রমশই দূরে সরে যাওয়া যার সঙ্গে নৈতিকতার প্রশ্নটি জড়িত। প্রফেসর আশুতোষ মুখপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তখন তার অফিস কক্ষটি ছিল দাঁড়ভাঙা ভবনের তিনতলায় এবং সিঁড়ি বেয়ে যখন তিনি উঠতেন তখন তার সামনে যারাই থাকতেন তাদের দুহাত জোড় করে প্রণাম করতে করতে উঠতেন। একদিন প্রশসানের একজন ব্যক্তিগত স্টাফ স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি রাস্তায় সবাইকে প্রণাম করে অফিসে উঠেন কেন? তার উত্তরে উপাচার্য বলেছিলেন বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোড় সবার আমি ছাত্র। এখন সেই দিনের অভিজ্ঞতাগুলো মিউজিয়ামে স্থান করে নিয়েছে এবং জরুরি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে উচ্চতর শিক্ষায় নিবেদিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ কি? রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেভাবে নাগরিক অধিকার সংকুচিত হচ্ছে ঠিক একই ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধাবিত হচ্ছে যেখানে শিক্ষক ছাত্র মুখ্য চরিত্র আর অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে ছাত্র রাজনীতি যার সঙ্গে জাতীয় রাজনীতি সম্পৃক্ত।

পাত্রকার পাতায় এখন প্রধান শিরোনাম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের কার্যকলাপ যা বিস্ময়কর অথচ তাদের নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী বিশেষত অবস্থানের কারণে। উপাচার্যের পদটি এটি কোন ব্যক্তি নয় একটি প্রতিষ্ঠান যাকে ঘিরে এই প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হয় জ্ঞানচর্চার অনুশীলন ক্ষেত্র, জ্ঞানী গুণীদের সমাবেশ, মুক্ত বুদ্ধি চর্চার তীর্থকেন্দ্র, যুক্তি পিঠে পাল্টা যুক্তি ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিভিন্ন কারণ বিগত দু'দশকে দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য অনেকগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছে আবার বেসরকারি খাতেও বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছে অনেকগুলো কিন্তু বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যগণ তাদের পদমর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এমন কিছু কার্যকলাপে জড়িত হচ্ছেন যা এ প্রতিষ্ঠানটির জন্য কলঙ্কজনক। জাতি কি দিনের পর দিন এ সব অপবাদ কিংবা অনুযোগ বয়ে বেড়াবে? প্রশ্ন উঠেছে তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কি? সেটা যদিহয় উচ্চতর শিক্ষা কিংবা গবেষণা তা হলো কর্তৃপক্ষ কেনইবা এ দ্বৈত ধারাকে বাস্তবায়নের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না? প্রশ্নটি হলো নৈতিকতার যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাম্প্রতিক কালে সংগঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যদের কার্যকলাপ।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে একজন শিক্ষার্থী যখন তার শিক্ষাজীবনের শেষ করে বিধিবদ্ধ প্রথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতেন তখন মেধার তালিকায় শীর্ষ স্থানকারী ছাত্ররাই এই পদে

আসতে পারতেন। তারপর সময়ের আবর্তে উচ্চশিক্ষায় এমফিল /পিএইচডি শেষ করে পদোন্নতি পেয়ে সহকারী/সহযোগী/অধ্যাপক হতেন এবং সেই পথে ধরেই শিক্ষকগণ একদিন উপাচার্য পদে উন্নীত হতেন সেটাই রীতি নীতি। বর্তমানের তুলনায় সেই সময়ে শিক্ষকদের চাকরির বেতন ভাতাদি কম ছিল এবং এই অল্প বেতন-ভাতা দিয়েই তাদের জীবন পাড়ি দিতে হতো। কিন্তু বর্তমানে দিন বদলের সনদে সার্বিকভাবে সরকারি পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বের তুলনায় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, চাকরিতে অবসর গ্রহনের বয়স বেড়েছে পয়ষট্টি (৬৫), উচ্চশিক্ষায় বেতন ভাতাদি সহ ডেপুটেশনের ব্যবস্থা রয়েছে ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতার ভোগান্তির পেতে হয় না শিক্ষকদের। তারপরও শিক্ষার মান নিয়ে কেন বারবার প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছেন দেশের শিক্ষার হার শতকরা ৭২ ভাগের ওপরে রয়েছে এবং সব স্থরে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের মানের ওপর নির্ভর করছে শিক্ষা তথা শিক্ষার্থীর মান উন্নয়ন এবং প্রায়শই পাবালিক বিশ্ববিদ্যালয় পাঠরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ যে শ্রেণীকক্ষে অনেক শিক্ষক পাঠদানে মনোযোগী নন, ক্লাসে সময়মত উপস্থিত হন না, প্রশ্ন করলে ছাত্রদের ওপর বিরক্ত হন, পরীক্ষায় নম্বর প্রদানে ও ফল প্রকাশে অনিয়ম ইত্যাদি যা নৈতিকতা বিপর্যয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রসাশনিকভাবে এ বিষয়গুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষ কোন শিক্ষকদের

বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থাপিত করছেন কিংবা কোন শিক্ষক অভিযুক্ত হয়েছেন তেমনটি খুবই কমই সোনা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে আরও কিছু চিত্র দেখা যাচ্ছে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী হয়রানি কিংবা ছাত্র নেতা কর্তৃক ছাত্রী হয়রানি যদিও তা প্রামাণ করা দুরূহ ব্যাপার। প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রথম পাতায় দেখা যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিরতা যেমন উপাচার্য অপসারণের ছাত্রছাত্রীদের মিছিল, মানববন্ধন, পরীক্ষা বর্জন, রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি। এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, নিয়োগ বাণিজ্য, টেন্ডার প্রদানে/পরীক্ষায় অসচ্ছতা ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাওয়াইয়ে দেয়ার আনুকল্যসহ আরও অনেক কিছু অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার ছেয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বেশি আগ্রহী নন।

এর কারণ বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় থাকে ঘিরে সৃষ্টি হয় এক একটি সিন্ডিকেট যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র নেতা, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও নির্মাণ প্রকৌশলীরা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোন ইস্যু নিয়ে যদি প্রতিদিনই আন্দোলন চলতে থাকে তাহলে পড়াশোনা হয় কখন এবং কি পরিবেশ বিরাজ করছে এই সব উচ্চশিক্ষায়তনগুলোতে? ভালো শিক্ষক ছাড়া ভালো ছাত্র তৈরি হয় না যেমন সত্য তেমনি ছাত্রের মান কখনও শিক্ষকের মানের

চেয়ে বড় হতে পারে না এটাও সত্য। এই সব বিষয় দিকভাল করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুজরি কমিশন (ইউজিসি) কাজ করলেও দৈনন্দিন কার্যক্রম দেখার জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি একাডেমিক প্রশাসন রয়েছে যাদের প্রতিনিয়তই রুটিন মাফিক রিপোর্ট করতে হয় ইউজিসির কাছে। বিগত কয়েক বছরের যাবৎ এ সংস্থাটি (Higher education quality enhancement project) নামে একটি কার্যক্রম চালু রেখেছে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে। এরই মধ্যে প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হযেছে। আপত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই প্রকল্পের ফলে শিক্ষা পদ্ধতিতে কিছু কাঠামোগত রূপান্তরের পদ্ধতি অনুশীলন (exercise) করা হচ্ছে যার সফলতার নির্ভর করবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাস্তবায়ন সক্ষমতার উপর যার জন্য আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় নৈতিকতার যে সংকট চ্যালেঞ্জ আকারে দেখা দিয়েছে তার সমাধান কীভাবে হতে পারে এর কোন দিকনির্দেশনা এ প্রকল্পে পাওয়া যায় না। কারণ গুণগত চলক যার সৃষ্টি হয় প্রথমত: পরিবার; দ্বিতীয়ত: শিক্ষকের সহচর্যে ও তৃতীয়ত: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ থেকে যার সর্বোচ্চ স্তর হলো বিশ্ববিদ্যালয়।

এখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার উপাদানটি বর্তমানে খুবই উপেক্ষিত হয়ে আসছে যার প্রধান কারণ শিক্ষা দর্শন থেকে শিক্ষকের

বিচ্যুতি ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তিতে আগ্রহ যাকে এক কথায় বলা হয় শিক্ষায় বাণিজ্য এবং ব্যাপারীর ভূমিকায় শিক্ষক। বর্তমানে পেশা হিসাবে শিক্ষকতা অনেকটা লাভজনক। বিশেষত: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে আর উচ্চশিক্ষায় বিশেষত: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরামর্শক খণ্ডকালীন শিক্ষক, গাইডবই তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে। এতে করে শিক্ষক যখন নগদ প্রাপ্তিতে আসক্ত হয়ে যায় তখন শিক্ষা দর্শনের যে মুখ্য বার্তা আলোকিত, উজ্জীবিত ও মানসম্মত নৈতিকতাভিত্তিক জনবল তৈরি করা, যারা হবে সমাজমুখী ও কল্যাণমুখী সেটা হয় উপেক্ষিত। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এখন সেই তিমিরে বিরাজ করছে যা থেকে উঠে আসা সহজ হবে না যদিও অসম্ভব নয়। ভর্তি নিয়ে অনিয়ম আগেও হয়েছে, হলে সিট বণ্টনে ছাত্র রাজনীতির প্রভাব এখন শতভাগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় উপাচার্য হওয়া এখন স্বাভাবিক ব্যাপার এবং ক্ষমতসীন দলের ছাত্র রাজনীতি প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাও সত্যি। তা হলে লেখাপড়া বা শিক্ষা কার্যক্রম বা গবেষণা কার্যক্রম দিকভাল করার দায়িত্বটি কি ছাত্র রাজনীতির বাহিরে রয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ? এ প্রশ্নটি সবাই হলেও অনুষদ চালান ডিন মহোদয়গণ, বিভাগ চালান হেড কিংবা চেয়ারম্যানগণ আর ছাত্রদের শিক্ষা দান কিংবা শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকগণ। তা হলে নিয়ন্ত্রণের সব পর্যায়ে গণতান্ত্রিক আচরণ রয়েছে কি? যদি থাকে তাহলে কেন ছাত্ররা শিক্ষদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে,

শিক্ষকগণ কেন বিভাগীয় প্রধানের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, বিভাগীয় প্রধানগণ ডিন অফিসের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে এবং ডিন অফিস কেন উপাচার্যের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত শিক্ষাকগণ কি জানেন তাদের শিক্ষকগণ কখন ক্লাসে উপস্থিত হন, কখন ক্লাস ত্যাগ করেন, কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে অফিস সময়ে ক্লাস নিতে যান এবং একি সঙ্গে একের অধিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি সুবিধা ভোগ করনে?

সর্বস্তরের এ অচলাবস্থা শিক্ষকদের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে যা মানসম্মত শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয় যেহেতু সমস্যাটি একদিনে তৈরি হয়নি। বিধানে আছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শতভাগ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যাকে বলা হয় (state within the state) তাহলে স্বল্প কিংবা বৃহত্তর পরিসরে প্রশাসনিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রক বা উপাচার্যের নিয়ন্ত্রক কে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নিধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটের গঠন কীভাবে হয়? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুজরি কমিশন (university grants commission) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমির অংশের নীতি-নির্ধারণী সংস্থা যাদের কোন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই এবং উপাচার্যের কাজের দিকভাল করে থাকে আচার্য সচিবলায় (Chanceller’s secretariat) যার সদস্য সচিব শিক্ষা সচিব নিজেই। তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্যদের নিয়ে পত্রপাত্রিকায় যে নষ্ট খবর প্রতিদিন আসছে তাতে এই সচিবালয় কি পদক্ষেপ নিচ্ছে? আরও মজার ব্যাপার যে সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার বাহিরে অবস্থিত সেখানকার উপচার্যরা প্রায়শই নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন বলে পত্র-পত্রিকায় খবর আসে এবং মোবাইল ফোনে মৌখিক পরীক্ষা কিংবা তাদের সচিবদের দিয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করতে দেখা যায়। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের দফতর ভাইরাসে আক্রান্ত তাই আচার্য সচিবলায় কর্তৃক শুদ্ধি অভিযান শুরু করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। এ প্রতিষ্ঠানটি ঠিক হয়ে গেলে তার সুফল সারা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে এবং যেখানেই অনৈতিক কার্যকলাপের প্রমাণ মিলবে সেখানেই আইন মাফিক ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষার ও গবেষণার মান উন্নয়নে এটাই হোক সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ যা হবে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

[লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও সাবেক জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবীদ সমিতি, ঢাকা]